OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 443 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 443 - 452
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

‘কথামৃতে’ তৎকালীন বঙ্গীয় ধর্ম-চিন্তা

প্রসেনজিৎ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
Email ID : pbiswas.vm@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
19th Bengal, Ramakrishna Paramahamsa, Religious thought, Kartabhaja, Tantra Sadhana, Vaishnava, Shakta, Theosophist, Hatayoga.

Abstract
Religion is soul of India. The history of that connection is ancient. In fact, religion is the main genre of Bengali literature throughout the early and middle-ages. In the 20th century Sri M (Mahendranath Gupta) narrated 'Sri Sri Ramakrishna KathaMrita' is an excellent prose treatise on post-Renaissance Bengali religious thought. Some people want to call the book an hagiography in terms of variation.

The thought and intellectual practice of 19th century that inspired us to think a new, many questions were crowding in the religious thought of that time. That interests us is the flow of all those thoughts throughout the 'Kathamrita'. Various arrangements of that religious thought are spread in the conversations of various people with Ramakrishna Paramahamsa. Based on this book which bears historical evidence, we would like to read the thoughts of Kartabhaja, Tantra Sadhana, Vaishnava, Shakta, Theosophist, Hatayoga etc and the precious response of Ramakrishna Paramahamsa.

Discussion

‘কথামৃতে’ তৎকালীন বঙ্গদেশের যে সকল ধর্মচিন্তার ছবি ফুটে ওঠে তার মধ্যে সবথেকে স্পষ্ট ও বিস্তৃত ছবি ব্রাহ্মসমাজের। কিন্তু ‘কথামৃতে ব্রাহ্ম-প্রসঙ্গ’ বিষয়টি এত বিস্তৃত যে, সেটি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দাবি রাখে। আমরা ‘কথামৃতে তৎকালীন বঙ্গীয় ব্রাহ্ম ভাবনা’ (আগস্ট ২০১৩, উদ্বোধন পত্রিকা) শিরোনামে সে নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি। বর্তমান প্রবন্ধের এই নির্দিষ্ট পরিসরে উনিশ শতকের বঙ্গে ব্যাপৃত অন্যান্য যে সব ধর্মচিন্তা শ্রীম তাঁর কালজয়ী গ্রন্থে তুলে রেখেছেন, সে বিষয়ে কথা বলবো।

১

ব্রাহ্মধর্ম ছাড়া আর যে সকল ধর্মচিন্তা সেই সময় বঙ্গদেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল কর্তাভজা সম্প্রদায় তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘কথামৃতে’ কর্তাভজা প্রসঙ্গের সঙ্গে আমাদের একাধিক বার পরিচয় ঘটেছে। এই ধর্মসাধনার উৎস অনেকটা কিংবদন্তির মতো। প্রামাণ্য লিখিত তথ্যের অভাবেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও লোকধর্মের এটা একটি বৈশিষ্ট্য। ঘোষপাড়ানিবাসী সদগোপ রামশরণ পাল এই ধর্মপ্রচার করলেও, তার আগে আর একজন প্রবর্তকের নাম কর্তাভজা সম্প্রদায়ে শোনা যায়। ইনি আউল চাঁদ। তাঁর সম্পর্কে নানান পরস্পর বিরুদ্ধ উপাখ্যান

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 443 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রচলিত আছে ঐ জনসমাজে। বলা হয়, তিনি মোট বাইশ জন শিষ্যকে দীক্ষা দিয়েছিলেন (যাঁদের মধ্যে রামশরণ অন্যতম)। একটি বচনে আউল চাঁদ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "এভাবের মানুষ কোথা হতে এলো।/ এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল। /এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটি মন, জয় কর্ত্তা বলি। / বাহুতুলি, করে প্রেমে ঢলাঢল।/ এ যে হাবা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো।"[১]

এই ধর্মে বিভিন্ন বর্ণের, এমনকি অন্যান্য ধর্মের মানুষদেরও যাতায়াত ছিল। খ্রিস্টান মিশনারি থেকে শুরু করে জয় নারায়ণ ঘোষাল, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেখানে গিয়েছিলেন। সেকালে এই সম্প্রদায় নিয়ে 'শিক্ষিত' মহলে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যেত। একধরনের মানুষ কর্তাভজাদের মধ্যেও ঈশ্বর-সাধনার সূক্ষ্ম দিক দেখতে পেতেন, যার অন্বেষণে রামমোহন রায় থেকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সকলের সেখানে আনাগোনা ছিল। নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' গ্রন্থে কর্তাভজা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন,

> "অক্ষয়কুমার দত্তের 'উপাসক সম্প্রদায়' পড়িয়া আমারও সেই বিশ্বাস (নেতিবাচক) হইয়াছিল। কিন্তু তিনদিন মেলার কর্ত্তাগিরি করিলাম, কই—জ-ঘ-ন্য তিন অক্ষরের একটিও দেখিলাম না।..."[ক২]

কর্তাভজা সম্প্রদায়ে যে প্রাণায়ামের সাধনা আছে সেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তিনি নিজেই বলেছেন,

> "কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ধর্মঠাকুর সহবাসে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম।"[৩]

এ সকল ইতিবাচকতার পাশাপাশি এই ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য কিছু কম নয়। দাশরথি রায় তাঁর একটি পাঁচালিতে লিখছেন —

> "নূতন উঠেছে কর্তাভজা, শুন কিঞ্চিৎ তার মজা/ সকল হতে শ্রবণে হয় মিষ্ট। /বাল বৃদ্ধা যুবা রমণী, নিষেধ মানে না যায় অমনি/অন্ধকারে পথলা হয় দৃষ্ট।"[৪]

১২৭০-এ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় কর্তাভজা সম্প্রদায়, ঘোষপাড়ার দোলমেলা এবং মেলার অর্থাগম বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণসহ যে সংবাদ পরিবেশিত হয় তাতে সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত ব্যভিচার সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করা হয়েছে—

> "যে সমাজে স্ত্রীলোকেরা লজ্জা ও কুলভয়ে গৃহের বাহির হইতে সাহসী হয় নাই, সেই সমাজে সেই স্ত্রীলোকেরা এক কর্তার অনুরোধে বহুসংখ্যক অপরিচিত পুরুষের সহিত একত্রে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জিত হইতেছে না। এক একটি পুরুষের নিকট ৪/৫ টি করিয়া যুবতী বসিয়া আছে...। এই ধর্মের এইরূপ প্রাদুর্ভাব হইবার কারণ অনুমান হয়, ইহার ভক্তদিগের নানাপ্রকার যথেচ্ছাচারিতার বিলক্ষণ সুবিধা আছে।"[৫]

১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'হালিশহর' পত্রিকায় লেখা হয়;

> "বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যত প্রকার ব্যভিচার সমুদয়ই বিকৃত প্রেম হইতে উৎপন্ন। কর্তাভজাদিগের স্বাধীন ভাবে নির্লজ্জ কুক্রিয়াই তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।"[৬]

এছাড়া 'বান্ধব', 'তত্ত্ববোধিনী', 'সংবাদ প্রভাকর'— সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই ধর্মমতের সাধন-পদ্ধতির প্রতি নিন্দা বর্ষিত হয়। এই জাতীয় বিরূপ সমালোচনার প্রসঙ্গে সম্প্রদায় প্রধান বা কর্তাভজা গুরুরাও অবহিত ছিলেন। 'ভাবের গীতে' স্বয়ং

[ক]. ঘোষপাড়ার দোলমেলা শেষে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের সময় নবীনচন্দ্র কাঁচড়াপাড়া থেকে ট্রেনে উঠলে রবিঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সে সময় মেলার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবিগুরুকে এই কথাগুলি বলেন নবীনচন্দ্র। পরে যা তিনি আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন।

দুলালচাঁদের রচনায় এর সাক্ষ্য আছে—

> "নিন্দুকে নিন্দে করে আমাকে দেখে আমার রীত,/ আমি বেল্লিক তুমি সবের মালিক,/ বল ঠিক কর তার উচিত, /আমার অর্থ স্বার্থ সামর্থ জব্দ করে নাও/আমাকে নিন্দুকের বন্দুকে সেরেস্তে রেখে দাও, ..."[৭] ('অপরাধ মার্জনা কর প্রভু')।

সহজিয়া রীতি এক প্রকার সাধন পদ্ধতি হলেও এর পুরুষ-প্রকৃতি ভাবনা সহজ বিষয় নয়। ধর্ম-ইতিহাসের পাতা উল্টালে সে সম্পর্কে আমরা বিশদ তথ্য পাই। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের পতনও এই একই পথ ধরে। নারী ও পুরুষ একত্রে বসবাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-প্রাপ্তির উচ্চ দর্শনের প্রায়োগিক দিক কঠিন ও দুর্গম। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যেত এক একজন পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারীর সহাবস্থান। ভাবতে অসুবিধা নেই যে এরা সকলেই উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের অধিকারী ছিল না। ফলে অনাচারের সম্ভাবনা সেখানে প্রশস্ত। সময়ের চাহিদাকে উপলব্ধি করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাই কর্তাভজাদের এহেন সাধনপদ্ধতি থেকে দূরে থাকবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'কথামৃতে' কর্তাভজা সম্পর্কে ঠাকুর বলছেন—

> ক) "এক মতে আছে, মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধনা করা। কর্তাভজা মাগীদের ভিতর আমায় একবার নিয়ে গিছিল। সব আমার কাছে এসে বসল। আমি তাদের মা, মা বলতে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, ইনি প্রবর্তক, এখনও ঘাট চিনেন নাই। ওদের মতে কাঁচা অবস্থাকে বলে প্রবর্তক, তারপর সাধক, তারপর সিদ্ধের সিদ্ধ।"[৮]
>
> খ) "হরিপদ এক ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে। সে বাৎসল্যভাব করে। হরিপদ ছেলে মানুষ, কিছু বোঝে না। ওরা ছোকরা দেখলে এই রকম করে। শুনলাম হরিপদ নাকি ওর কোলে শোয়। আর সে হাতে করে তাকে খাইয়ে দেয়। আমি ওকে বলে দিবো ও-সব ভাল নয়। ওই বাৎসল্যভাব থেকেই আবার তাচ্ছল্যভাব হয়।"[৯]

লক্ষণীয়, কর্তাভজাদের সাধনপদ্ধতির দার্শনিক দিক নিয়ে ঠাকুর কোন কথা বললেন না কারণ তিনি জানেন এই পদ্ধতিও ঈশ্বরলাভের অনুগামী কিন্তু কলিতে মানুষের 'অন্নগত প্রাণ'; এদের দিয়ে এহেন সাধনা করালে ব্যভিচারের সম্ভাবনা প্রবল। তাই ঠাকুর এই পথাবলম্বনে বিরত থাকতে বলে মানুষের সময়-উপযোগী পথ ও পদ্ধতিকেই সামনে এনেছিলেন, যা অনেকখানি ধরা আছে 'কথামৃতে'।

২

উনিশ শতকের তন্ত্রসাধনারও কিছু ছবি ধরা পড়েছে শ্রীমর কলমে। 'তন্ত্রি' বা 'তন্ ত্রি' থেকে 'তন্ত্র' শব্দের উৎপত্তি। তন্ত্র শব্দের অন্ত 'ত্র' ত্রাণ বা মুক্তির নির্দেশ দেয়। বলা হয়, যে শাস্ত্রোক্ত পন্থায় সাধন করলে জীব মোক্ষ লাভ করতে পারে তাকেই তন্ত্র শাস্ত্র বলে। তবে, পরমার্থ লাভের যে-কোন পন্থাই তন্ত্রের পথ নয়। তন্ত্র শিব ও শক্তি সম্বন্ধীয় উপাসনা। কোন যুগ থেকে তান্ত্রিক উপাসনা ভারতে প্রচলিত তা এখনও অনির্ণীত। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র বা পুরাণে তন্ত্রের উল্লেখ নেই। তান্ত্রিকদের ধারণা তন্ত্রের উৎপত্তি বেদ থেকে ফলত তন্ত্রোক্ত সমস্ত আচারই বৈদিক।

তন্ত্রমতে পরমার্থ অদ্বয় সত্য শিব ও শক্তি —এই দুই রূপে বিরাজিত। শিব নিষ্ক্রিয়, শক্তি গতিময়। কিন্তু শিব ও শক্তি যুক্ত না হলে পরমার্থ পাওয়া সম্ভব নয়। অদ্বয় সত্যের এই দুই রূপ মিথুন রূপে এক হয়ে থাকেন। তান্ত্রিকদের কাম্যবস্তু হল এই মিলিত অবস্থা। প্রবৃত্তি হল শক্তি আর নিবৃত্তি শিব। প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির মিলন ঘটাতে পারলে অর্থাৎ শক্তির উৎসে শক্তি ফিরিয়ে আনতে পারলে পরম সত্যের উপলব্ধি ঘটে। এই শিব ও শক্তির মিলন ঘটানোই তান্ত্রিকের মূল লক্ষ্য। যেখানে অষ্টপাশ মুক্তি (ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি), ভাবত্রয় (পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাব), সপ্তআচার (বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, কৌলাচার), পঞ্চ মকার (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন), কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ, ষটচক্র (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মানপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা) ইত্যাদি পথকে অবলম্বন করে অতিগুহ্য পদ্ধতিতে সাধন করতে হয়। এসবের মধ্যে অন্যতম হল কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। দেহ সাধনার প্রধান অঙ্গ এই যোগ। মানবদেহের অপরিমেয় অধ্যাত্মশক্তি হল কুণ্ডলিনী। এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্যই

তান্ত্রিকেরা এহেন সাধনা করেন। তবে শুধু শক্তিকে জাগিয়ে তুলেই তাঁরা ক্ষান্ত হন না, সেই শক্তিকে ছড়িয়ে দেন দেহের সমস্ত কোষে। কুণ্ডলিনী শক্তিকে ষটচক্র ভেদ করে সহস্রারব্রহ্ম শিবের সঙ্গে যুক্ত করাই এঁদের প্রধানতম উদ্দেশ্য। কুণ্ডলিনী যোগক্রিয়ার জন্য নির্জন সাধনোপযোগী স্থান, সিদ্ধপীঠ নির্বাচন করতে হয়। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবৃক্ষ দ্বারা নির্মিত পঞ্চবটীতে সাধনা করেছিলেন। সাধনার জন্য পঞ্চমুণ্ডি (চণ্ডাল মুণ্ড ২, শৃগাল মুণ্ড ১, বানর মুণ্ড ১, সর্পমুণ্ড ১) বা একমুণ্ডির আসন তৈরি করতে হয়। এই সাধনার মূল প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুরূহ। সাধনার পথ যেন সরু সুতোয় বাধা, সাধককে তার উপর দিয়ে অনেকক্ষণ চলতে হয়— একটু পা পিছলে গেলেই চরম প্রাপ্তি থেকে মুখ থুবড়ে পড়তে পারেন তান্ত্রিক। দুরূহতার কারণে এবং যেহেতু দেহ নিয়ে সাধনা সে কারণে সঠিক প্রকারের অনুবর্তী না হতে পারলে ব্যভিচারের সম্ভবনায় ষোড়শ শতাব্দীতেই চৈতন্যদেব তন্ত্রসাধনার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। উনিশ শতকে কর্মব্যস্ত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সেই সাধনাকে নিষেধ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। কর্মব্যস্ত, সংসারমুখী মানুষের কাছে ঈশ্বরকে স্মরণের সামান্য সময় যখন সংকুলান সেখানে দীর্ঘ সময়ব্যাপী শরীরনির্ভর এই তন্ত্র সাধনা যে সেদিনের সাধারণ মানুষের পক্ষে উপযোগী নয় তা আগেই বুঝেছিলেন ঠাকুর। আর সাধনা যদি সময় উপযোগী না হয় তাহলে পতনের সম্ভবনা প্রবল। সেই ছবিও ধরা পড়েছে এই গ্রন্থে। ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে রতন প্রভৃতির সঙ্গে ঠাকুরের কথা হচ্ছে। শ্রীম লিখছেন—

> "কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় কতকগুলি বাঙালী ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ঠাকুরের পূর্ব পরিচিত। ইঁহারা তন্ত্রমতে সাধন করেন। পঞ্চ-মকার সাধন। ঠাকুর অন্তর্যামী, তাহাদের সমস্ত ভাব বুঝিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন ধর্মের নাম করিয়া পাপাচরণ করেন, তাহাও শুনিয়াছেন। সে ব্যক্তি বড় মানুষের ভ্রাতার বিধবার সহিত অবৈধ্য প্রণয় করিয়াছে ও ধর্মের নাম করিয়া তাহার সহিত পঞ্চ-মকার সাধন করে, ইহাও শুনিয়াছেন।"[১০]

এরা ঠাকুরের সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ কথা বললেন, ঠাকুর এদেরকে সামনে পেয়ে গুহ্যতত্ত্বের, দেহসাধনার বিপত্তির প্রসঙ্গে নিজের মতামত জ্ঞাপন করলেন এবং ঈশ্বর-প্রাপ্তির সহজ সরল পথের সন্ধান দিলেন। ফলে— 'আগন্তুক বাবুরা এই বার গাত্রোত্থান করিলেন ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, তবে আমরা আসি। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন ও মাস্টারকে বলিতেছেন, "চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী"। (সকলের হাস্য)'[১১] 'কথামৃতে' বর্ণিত এই সাধকরা যে তন্ত্র সাধনার বিপথে গিয়ে দেহসুখ ভোগ করত এবং ঠাকুর যে সে সংবাদ জানেন—সেকথা শ্রীম আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ এই সাধন পদ্ধতিকে অস্বীকার করেন নি। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৪ এই সময় পর্বে ঠাকুর নিজেই তন্ত্র সাধনার মধ্যে দিয়ে যাত্রা করেছিলেন। এবং সেই সাধনা থেকে তাঁর সাধক-জীবনের ঝুলিতে সঞ্চিত হয়েছিল বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা। মানদাশংকর দাশগুপ্ত তাঁর 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে লিখছেন— 'বিবস্ত্র যুবতীকে দেবী জ্ঞানে পূজা করা সম্ভব হলেও ব্রাহ্মণী তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণ) যখন সেই বিবস্ত্র যুবতীর কোলে বসে তন্ময় চিত্তে জপ করতে বললেন তখন ঠাকুর আতঙ্কে কেঁদে উঠে বলেছিলেন,

> "মা, (শ্রীশ্রী জগদম্বা), তোর শরণাগতকে এ কি আদেশ করছিস? তোর দুর্বল সন্তানের ঐ দুঃসাহসিক কাজ করবার সামর্থ্য কোথায়?"[১২]

ঠাকুরের এই উচ্চারণ শুনে মনে হয় এই উক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ যেন শুধু নিজের জন্য করছেন না— বলতে চাইছেন সাধারণ মানুষের (এক্ষেত্রে পুরুষের) মধ্যে সেই ক্ষমতা কোথায় যে, সে বিবস্ত্রা নারীর কোলে বসে ঈশ্বরচিন্তা করে? ঠাকুর নিজে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এসব সাধনায়— শবের খর্পরে মাছ রেঁধে খেয়েছেন, গলিত নরমাংসেরও স্বাদ নিয়েছেন। ফলে, এই সাধনার দুরূহতা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। একজন অভিভাবকের (অগ্রণী সাধক হিসাবে) জায়গা থেকে তাই এপথে চলতে নিষেধ করেছেন উনিশ শতকীয় সংসারমুখী ছাপোষা মানুষদের। মানুষের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু ঈশ্বর-প্রাপ্তি তাই তাকে কঠিনতার পথে পাওয়ার সাধ নেই ঠাকুরের। তাঁর নিজের মানস সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার সন্তান ভাব'। সেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 443 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'ভাবকে' সাধারণের করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। কারণ একমাত্র সহজতাকেই গ্রহণের ক্ষমতা আছে সকলের। 'কথামৃতে' ঠাকুর বলছেন—

> "কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। —শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কই? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর একদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিকশ্চার।"[১৩]

৩

দুটি আলাদা ধর্মের মধ্যে বিরোধ ভারতীয় ইতিহাস বা বিশ্বইতিহাসে অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। ভারতবর্ষ যেহেতু ধর্মপ্রধান দেশ তাই এখানে প্রতিটি ধর্মের নানান শাখায় পল্লবিত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কখনও কখনও এই সব শাখার উপশাখাও তৈরি হয়েছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিশেষত বঙ্গদেশে হিন্দুধর্মের প্রধান দুটি শাখা বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও শাক্ত সম্প্রদায়। এদের মধ্যে ইষ্ট দেবতা থেকে শুরু করে আচার আচরণে সর্বত্রই অমিল স্পষ্ট। এবং এই পথ ধরেই এরা প্রকাশ্যে একে অপরের নিন্দা করে থাকেন। সেই সাম্প্রদায়িক বিষয়টিই 'কথামৃতে'র পাতায় বার বার উঁকি দিয়েছে। এদের মধ্যেকার এই পার্থক্যের ভূগোলটির সামান্য পরিচয় নেওয়া যাক।

বৈষ্ণব ধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি। বৈষ্ণবরা মনে করে জগৎ এবং ঈশ্বর আলাদা অর্থাৎ দ্বৈত। শাক্তধর্মেও এই ভেদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে বৈষ্ণবরা এই দ্বৈততাকেই নিত্য মিলনের উপায়রূপে স্বীকার করেন। উভয়ের বিশ্বাস, সংস্কার, পূজা পদ্ধতি —এসবেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, রাধা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য আর শাক্তরা কালী, তারা, মহাবিদ্যা, দুর্গা, অম্বিকা, চণ্ডিকার—উপাসক। বৈষ্ণবরা তুলসীবৃক্ষ, তুলসীপত্র ও তুলসীমাল্য সাধনার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেন। কপালে থাকে খড়িমাটি বা সাদা চন্দনের তিলক হাতে জপ মালা। 'কথামৃত'কার বৈষ্ণব বলরামের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> "বলরামের বংশ পরম বৈষ্ণববংশ। বলরামের পিতা বৃদ্ধ হইয়াছে—পরম বৈষ্ণব। মাথায় শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তে সর্বদাই হরিনামের মালা, জপ করিতেছেন। ইহাদের উড়িষ্যায় অনেক জমিদারি আছে। আর কোঠারে, শ্রীবৃন্দাবনে, ও অন্যান্য অনেক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা আছে ও অতিথিশালা আছে।"[১৪]

অন্য দিকে শক্তি সাধকেরা বিল্বপত্র, বিল্ববৃক্ষ, রুদ্রাক্ষ মালা ও জবাকে গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে রক্তচন্দনের ব্যবহার বেশি। উভয়ের মধ্যে হিংসা এবং অহিংসার জীবনদর্শনগত পার্থক্য তো আছেই।

দুটি সম্প্রদায় ভক্তিমূলক হলেও মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূল ভিত্তি দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এই ধর্মে কৃষ্ণ সকলেরই প্রেমে ধরা দেন কিন্তু শাক্ত ধর্মে দেবীর অনুগ্রহ না হলে কিছু হয় না। বৈষ্ণব ধর্মে প্রেম বলতে বোঝায় কৃষ্ণপ্রীতি; রাধাকৃষ্ণের লীলাকে সামনে রেখে এরা কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হতে চায়। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ইত্যাদি স্তর পার হয়ে মহাভাবে পৌঁছায় বৈষ্ণবরা।

শাক্তসাধকেরা বীর্যের সাধক, তারা দেহমধ্যস্থ শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য নানান আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডের আশ্রয় নেয়। কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার জন্য এরা দীক্ষা, নাড়ী, বায়ু, ষটচক্র, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে। পঞ্চ-মকারের সাধনাও এদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং শক্তি সাধনার মূল কথা হল দেহের অভ্যন্তরস্থ শক্তিকে জাগিয়ে তোলা আর বৈষ্ণব ধর্মে মুখ্য বিষয় সাধকের হৃদয়ে 'রাধাভাব' বা 'সখীভাব' জাগিয়ে তোলা। যে কোনো ধর্মেই উপাসনার দুটি দিক থাকে। একটি তার বাহ্যসাধনা অন্যটি আন্তর সাধনা। বাহ্য সাধনার ক্ষেত্রে এই দুই ধর্মই দেব বা দেবীর নামকীর্তন ও শ্রবণকে গুরুত্ব দিয়েছে। শক্তির সাধক কালী নাম শ্রবণ করেন আর বৈষ্ণবরা হরি নাম। বৈষ্ণবমতে, বাহ্য সাধনা থেকে রতির উৎপত্তি, আর এই রতি পাঁচ প্রকার— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। সর্বপ্রধান রস মধুররস এবং তার মধ্যে 'রাধাভাব' শ্রেষ্ঠ। শাক্ত সাধক নিজের দেহকেই সাধনপীঠ মনে করলেও তাদের সাধনা ভাবপ্রধান নয়, ক্রিয়াপ্রধান। তারা শক্তি জাগরণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভ করেন। আচার আচরণের মধ্যে বিস্তর ফারাকের কারণে বঙ্গদেশে এই দুই সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। ২৭ মে ১৮৮৩, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিজের ঘরে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 443 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দাঁড়িয়ে ঠাকুর ভক্তদের বলছেন–

> "বিদ্বেষ ভাব ভাল নয়, —শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়। পদ্মলোচন বর্ধমানের সভাপণ্ডিত ছিল; সভায় বিচার হচ্ছিল, —শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচন বেশ বলেছিল— আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নেই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই। (সকলের হাস্য)"[১৫]

ঈশ্বরলাভ হল প্রধান উদ্দেশ্য—সেই পথে যাওয়ার জন্য আলাদা আলাদা মানসিকতা, আলাদা আলাদা ভাবনা নিয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন পন্থা। ফলে পরস্পর বিরোধিতা, কটূক্তি—অবৈজ্ঞানিক। সেখানে নিজ নিজ সাধনাকে সম্পূর্ণতা দেওয়াই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন—

> "অনেক বৈষ্ণব ভক্ত বাহিরে মালা, গ্রন্থপাঠ ইত্যাদি করেন কিন্তু ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুলতা নাই।"[১৬]

ঈশ্বরের পথে যখন কোন মানুষ একান্ত চিত্তে সাধনা করে তখন তার এই বিরোধিতার অবকাশ থাকে না। তাই বিরোধ বা বিদ্বেষ অংশটি যারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরে মনোনিবেশ করতে পারে না, আচারে আবদ্ধ হয়ে থাকে তাদের আচরণেই প্রকাশ পায়। পারস্পরিক এই বিরোধের চিহ্নটি সুন্দর ফুটেছে 'কথামৃতে'র পাতায়, 'শ্রীরামকৃষ্ণ— (বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) ...আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাত করে সেজবাবুর কাছে আনালুম। সেজবাবু খুব যত্ন খাতির করলে। রূপার বাসন বার করে জল খাওয়ানো পর্যন্ত। তার পর সেজোবাবুর সাথে বলে কি— 'আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না!' সেজোবাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হয়ে উঠল। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি!

শ্রীমদ্ভাগবত – তাতেও নাকি ওই রকম কথা আছে, 'কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা'। সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।

শাক্তরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন, শাক্তরা বলে –

> "তা তো বটেই, মা রাজেশ্বরী— তিনি কি আপনি এসে পার করবেন? —ওই কৃষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য।' (সকলের হাস্য)
>
> ...যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। ...বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম। তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—শিবঃ কেবলঃ—কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে, —কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।"[১৭]

এখানে সমন্বয়ের বার্তা দেওয়ার সঙ্গে আর একটি বিষয়ে সতর্ক করলেন ঠাকুর। ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টি করেছে মানুষ, ফলে সেখানে ব্যক্তিভেদে কিছু পক্ষপাতিত্বের অবকাশ ছিলই। অনেক সময় সেই অবকাশের সংকীর্ণ স্বার্থ মেটাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থগুলির কিছু বক্তব্য সাম্প্রদায়িকতার পরিসর নির্মাণ করে ফেলে— ফলে, মানুষের সৃষ্ট এহেন গ্রন্থ গুলিকে ধ্রুব সত্য ভাবার দরকার নেই। মানুষ তার উন্মুক্ত চিন্তার, মানবিকতার অনুভূতি থেকে বিচার করে ঈশ্বর, ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, গুরু —এসব গ্রহণ করবে। এখন প্রশ্ন হল, যে ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে তা উৎকৃষ্ট ঈশ্বরচিন্তার আধার হিসাবে গণ্য হতে পারে? যদি না হতে পারে, তাহলে শ্রীমদ্ভগবত গীতা কি উচ্চমানের দর্শন নয়? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, জগতে ভাল খারাপ মিলে মিশে থাকে; প্রকৃত জ্ঞানী সেগুলিকে চিহ্নিত করে ইতিবাচক অংশটুকু গ্রহণ করে বাকিটা বর্জন। হাঁস যেমন দুধের সারটুকু নেয় জল পড়ে থাকে, ঠিক তেমন। মানুষকেও এই গুণের অধিকারী হতে হবে।

৪

এবার আসি থিয়োজফিস্টদের প্রসঙ্গে। যদিও থিয়োজফিস্টদের দর্শন আদপে কোন ধর্মচিন্তাকে আশ্রয় করে না, এ কথা আজ প্রমাণিত। তবুও এই অধ্যায়ে আমরা এদের নিয়ে কিছু কথা বলব কারণ সেই সময়ে থিয়োজফিস্টরা নিজেদের ধর্মপ্রবক্তা হিসাবে প্রমাণিত করবার চেষ্টা চালিয়েছিল এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে —উভয় প্রান্তে কিছুকালের জন্য হলেও তাদের সেই প্রভাব মানুষ অস্বীকার করতে পারে নি, বঙ্গদেশও নয়। 'কথামৃতে'ও সে প্রসঙ্গে কিছু আলাপচারিতা চলেছে।

১৭ নভেম্বর, ১৮৭৫ এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা হেলেনা পেট্রোভনা ব্লাভাৎস্কি (১৮৩১-৯১)। তাঁর

দুই প্রধান সহকারী অলকট এবং উইলিয়াম জাজ। জাজ আমেরিকাতে এই সোসাইটির প্রচার-কার্যের প্রাণপুরুষ ছিলেন। বহু জায়গাতে ফাঁকা চেয়ারের সামনে বক্তৃতা করেও ১৮৯৫-এর মধ্যে সোসাইটি একশ'র বেশি শাখা স্থাপন করতে সমর্থ হয়। নিজেদের কার্যকারিতাকে প্রচারে আনার জন্য ১৮৭৭-এ ব্লাভাৎস্কি 'Isis Unveiled' এবং ১৮৮৮-এ 'Secret Doctrine'[ক] — নামে দুখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিখ্যাত স্বামী দয়ানন্দও এই সময় কিছুদিন ব্লাভাৎস্কির পাতা জালে ধরা দিয়েছিলেন, পরে অবশ্য বিষয়টি বুঝতে পেরে সেখান থেকে সরে আসেন। 'অমৃতবাজারে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষও মোহিত হন এদের কার্যকারিতায়। 'ব্লাভাৎস্কি-শিশিরকুমার ঘোষ সাক্ষাৎকার'টি অলকটের ডায়েরি থেকে উদ্ধার করে ১২ বছর পর ১৫ মার্চ, ১৮৯৫তে 'অমৃতবাজার' প্রকাশ করে। তার কিছুটা অংশ এই রকম—

> "তিনি (শিশিরকুমার ঘোষ) আমাদের পবিত্র গ্রন্থের তাৎপর্যে বিশ্বাসী এবং তার পক্ষসমর্থনে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন বলে মাদাম ব্লাভাৎস্কি তাঁকে ফিনমেনা দেখান, যথা নিজের মাথা থেকে কিছু কালো চুল টেনে বার করেন, অদৃশ্য ঘন্টা ধ্বনি করেন, এবং কালো ফ্রেম ও হ্যাণ্ডেলযুক্ত একটি আয়নার অনুরূপ আয়না শূন্য থেকে নামিয়ে আনেন, যেটিকে তিনি সেদিনই এক মাস্টার-এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এই সময়ে আমি (অলকট) উপস্থিত ছিলাম। চলে যাবার দুদিন আগে শিশিরবাবু ঐ আয়না ডবল করে দেওয়ার ব্যাপারটি আবার দেখাবার জন্য অনুনয় করেন।"[১৮]

থিয়োজফিস্টদের এই গ্রহণযোগ্যতার মূলে ছিল গুপ্ত রহস্যবাদ। তারা যতই 'সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব', 'ধর্ম সমবায়'— ইত্যাদির কথা বলুন; কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ছিল অলৌকিক অজ্ঞেয়তা। শিশিরবাবুও তাদের কাছে ধর্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু জানতে চান নি, মিরাকেল কিছু দেখতে চেয়েছিলেন। যে সব অদ্ভুত জিনিস তারা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করত তা পড়লে সাধারণ মানুষ চমকে উঠে ভাবত— আমাদের জানার বাইরের পৃথিবী এত বড়! পরবর্তীকালে সোসাইটির আর একজন নেত্রী অ্যানি বেশান্তের সাথে 'মাদুরা মেল' পত্রিকার এক সাংবাদিকের কথোপকথনে (১০ জুন, ১৮৯৩) এদের অলৌকিক গুপ্তপথের কিছু কথা জানা যায়। সাক্ষাৎকারটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল –

> "সাংবাদিক— কিন্তু মাদাম ব্লাভাৎস্কি যে অদৃশ্য স্থান থেকে ফুল বার করতেন হিমালয়ের গহন থেকে বাতাসে ভেসে আসা চিঠি পেতেন? বেশান্ত— মাদাম ব্লাভাৎস্কি এমন কিছু নৈসর্গিক এবং মনস্তাত্ত্বিক নিয়ম জানতেন যার বিষয়ে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই অজ্ঞ। ঐ সব জ্ঞানের দ্বারা তিনি এমন ফলোৎপাদন করতেন যা মিরাকেল বলে মনে হয়।... সাংবাদিক— ... আচ্ছা সত্যই আপনার কোনোই সন্দেহ নেই— ভেলকিবাজি ঘটেনি? আপনার ভুল হচ্ছে না তো? বেশান্ত— না। মাদাম ওসব কাজ করেছেন সিদ্ধদের কাছ থেকে আহৃত জ্ঞানের দ্বারা। সাংবাদিক— আপনি জানেন, কিভাবে ওটা হয়? বেশান্ত— হ্যাঁ। তিনি বলেছিলেন, ওটা হয় সূক্ষ্ম (astral) শরীরের সাহায্যে।"[১৯]

এখানেও আমরা দেখলাম অলৌকিকত্ব, তার প্রামাণিকতা —এই সব নিয়ে কথা হচ্ছে কিন্তু থিয়োজফিস্টরা নিজেদের ধর্ম প্রবক্তা হিসাবেই প্রমাণিত করবার চেষ্টা করত। প্রাগুক্ত পত্রের সাংবাদিক তাই মাদামের অলৌকিকতার কারণ হিসাবে একজন ধর্মপ্রণেতার আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনাকেই চিহ্নিত করেছিল, 'এটা তো কম কথা নয়—আমি (মাদাম) একটা নতুন সম্প্রদায় বা নতুন ধর্ম স্থাপন করছি!! উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক সময়ে বিচিত্রভাবে কাজ করে।' ঠাকুর এই বিষয়টির তীব্র বিরোধিতা করেছেন 'কথামৃতে'। ঈশ্বর বা ধর্মের সঙ্গে অলৌকিকতা বা সিদ্ধাইয়ের পার্থক্য করেছেন বারবার। ঈশ্বর লাভের পথে এহেন 'প্রাপ্তি', বাধা স্বরূপ। তন্ত্র বা যোগের পথেও ঠাকুর একই কারণে যেতে নিষেধ করতেন। সেখানে যোগী বা তান্ত্রিকের কিছু দেহগত ও মনোগত শক্তি লাভ হয়, যাকে সাধারণ মানুষ মিরাকেল বলতে পারে, কিন্তু তা কখনই ঈশ্বর-প্রাপ্তি নয়। শ্যাম বসু থিয়োজফিস্টদের সম্পর্কে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করতে, তিনি সেই কথাই বলেছেন—

> "মোট কথা এই, যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হালকা থাকের লোক। আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানারকম শক্তি চায়, তারাও হালকা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হব, এই শক্তি। অন্যদেশে একজন কি কথা

[ক]. এই বইয়ের শেষ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করে ব্লাভাৎস্কি মারা যান।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 443 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বলছে তাই বলতে পারা এই এক শক্তি। ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি হওয়া এই সব লোকের ভারী কঠিন।"[২০]

১৮৮৫-র ২৭ অক্টোবর যখন ঠাকুর এই কথা বলছেন তখন সোসাইটির বুজরুকি মানুষের সামনে আসে নি। সেই সময়ই থিয়োজফিস্টরা যে বিপথগামী সে কথার ইঙ্গিত দিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে সোসাইটির ভিত্তিমূল যে ফাঁপা সেকথা প্রমাণিত হওয়ার বহু পূর্বে সে সত্য ঠাকুরের কথায় উনিশ শতকেই উঠে এসেছিল–

> "শ্যাম বসু– তারা বলে, মহাত্মা সব আছেন। আপনার কি বিশ্বাস? শ্রীরামকৃষ্ণ– আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। ..."[২১]

অর্থাৎ যারা প্রবক্তা তাদের যদি মহাত্মায় বিশ্বাস থাকে তবে আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সোসাইটির বুজরুকি সামনে এল তখন আর একথা ভাবতে কোন অসুবিধাই নেই যে, সোসাইটির শীর্ষনেতাদেরই বিষয়টিতে বিশ্বাস ছিল না; কারণ পূর্ব পরিকল্পিত ও সাজানো বিষয়ে কারোরই কখনও বিশ্বাস জন্মায় না। ফলে বাইরের পৃথিবীকে ঠকানো গেলেও প্রবক্তাদের কাছে প্রথম থেকেই সেটি ছিল মিথ্যা। ঠাকুর দূরদর্শী বলে বিষয়টিকে সরাসরি আঘাত না করে গভীরে গিয়ে সে সত্যকে উন্মোচিত করলেন। তাই একদিক দিয়ে সে দিনের সাক্ষাৎকারেই বর্হিবিশ্বের একজনের কাছে থিয়োজফিস্টরা ধরা পড়ে গেল। সেই একজনকে সত্যও বলতে পারি ঠাকুরও বলতে পারি।

এই আলোচনার শুরুতে আমরা যেমন বলেছিলাম যে সমকালে সোসাইটি তাদের অলৌকিক উন্মাদনা নিয়ে বঙ্গদেশের হৃদয়ে অনেকটা প্রভাব ফেলেছিল, এখন সেকথার সামান্য পরিচয় নেওয়া যাক। প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) যিনি বিখ্যাত ইংরেজি-নবিশ লেখক, বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র, এককালে ইয়ংবেঙ্গল পরে সমাজ হিতৈষী, কলকাতা ও ভারতবর্ষের প্রধান গ্রন্থাগারের প্রধান সংগঠক– তিনি বঙ্গদেশে থিয়োজফি আন্দোলনের আদি নায়ক। উন্মাদনা এতদূর যে ১৮৮২, ১৯ মার্চ কলকাতায় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে ড: রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখের উপস্থিতিতে অলকটকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র স্বাগত ভাষণে মাদামের 'শ্রীচরণে অশ্রুবারিসহ উপনিবেশের ইচ্ছা' প্রকাশ করেন। মাদামও তাঁর ভক্তদের ইচ্ছা পূরণের জন্য ৬ এপ্রিল কলকাতায় আসেন। অতঃপর 'বেঙ্গল থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। যার সভাপতি– প্যারীচাঁদ মিত্র, সহ সভাপতি– দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর ও রাজা শ্যামশঙ্কর রায়, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ– নরেন্দ্রনাথ সেন, সহ সম্পাদক– বলাইচাঁদ মল্লিক ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতেও 'সোসাইটি' বেশ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্ল্যানচেটে উৎসাহী ছিলেন। ঠাকুর বাড়িতে বসত মহিলা থিয়োজফিক্যাল সভা। সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল ব্লাভাৎস্কি ও অলকটের। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী 'লেডিজ থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি'র সভানেত্রী ছিলেন (১৮৮২-৮৬)। তবে এই সমর্থনের পাশাপাশি বিরোধিতাও তৈরি হচ্ছিল সাধারণ জনমানসে। দুই রকম খবরই প্রকাশিত হত কাগজে। পরে এই সমস্ত জটলাকে নিরসন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতায়।

৫

শাক্ত তান্ত্রিকদের মতো হঠযোগও একপ্রকার শক্তিলাভ, যার থেকে যোগীরা ব্যক্তি-শরীরে সেই শক্তি ব্যবহার করতে পারে। তবে সেখানে পৌঁছাতে গেলে কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। 'হঠপ্রদীপিকা', 'দত্তাত্রেয় সংহিতা', 'গোরক্ষ সংহিতা' —এহেন গ্রন্থে সেই সাধন প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে।

এই সম্প্রদায়ের সদস্যদের আহারের বিষয়ে বিশেষ বিধিনিষেধ আছে। অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত—এই চার প্রকার রস এবং মাছ, মাংস, মদ—অভক্ষ্য। যব, ধান, দুধ, মধু —এদের সুপথ্য। স্ত্রী সংসর্গ কোনমতেই কাম্য নয়। স্ত্রী সংসর্গ করলে বিন্দু ক্ষয় হয় এবং বিন্দু ক্ষয় হলে আয়ু ও বল নাশ হয়। সুতরাং স্ত্রী-লোক থেকে সর্বদাই দূরে থাকার নির্দেশ দেয় হঠযোগ। এদের উপদ্রব-শূন্য নির্জনস্থানে যোগাভ্যাস করার এবং সেই স্থান পরিষ্কার রাখার বিশেষ নির্দেশ আছে–

"সুরাজ্যে ধার্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
একান্তমাঠকামধ্যে স্থাতক্যং হঠযোগিনাম।।"[২২] (হঠ প্রদীপিকা)

এরা যে স্থানে যোগাভ্যাস করবে সেখানে বহুসংখ্যক ধার্মিক লোকের বসবাস কাম্য। উপদ্রবশূন্য এবং সুন্দর ভিক্ষা পাওয়া যাবে সেরকম স্থানকেই এরা যোগাভ্যাসের জন্য নির্বাচন করে। এই অনুশীলনের নানান কৌশলের মধ্যে অন্যতম আসন। মোট চুরাশি প্রকারের আসনের মধ্যে পদ্মাসনই শ্রেষ্ঠ। তবে এদের পদ্মাসন প্রচলিত পদ্মাসনের মত নয়। বাম উরুর উপরে ডান পা এবং ডান উরুর উপরে বাম পা স্থাপন করে যেভাবে কোন কিছুকে ধরতে হয় সেইভাবে পিছন দিক দিয়ে দুই হাত দিয়ে অঙ্গুষ্ঠ ধরতে হয় এবং চিবুক বুকে স্থাপন করে দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগে স্থাপন করতে হয়। একেই পদ্মাসন বলে। এই আসন চলাকালে যোগী নাক দিয়ে বাতাস টেনে শরীরে ধারণ করে। এই প্রকরণ কুম্ভক নামে পরিচিত। 'হঠপ্রদীপিকা'-তে বহুবিধ কুম্ভকের কথা বলা হয়েছে। ক্রমাগত কুম্ভক অভ্যাসে দ্বারা যোগী আসন থেকে শূন্যে অবস্থান করতে পারে। এ ছাড়া এদের বিশ্বাস এ সব অভ্যাসের দ্বারা দেহের লঘুতা, দীপ্তি— ইত্যাদি বৃদ্ধি হয়। অল্প বা অত্যধিক আহারেও কোন অসুবিধা হয় না। আর আছে মুদ্রা। মাটির দিকে মাথা ও শূন্যে পা রেখে এই যোগ সাধন করতে হয়। প্রথম দিন অল্পক্ষণ অভ্যাসের পর দিনদিন সময় বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গ্রন্থে। এর দ্বারা শুক্লকেশ ও মাংস কুঞ্চন রূপ বার্ধ্যক্যের চিহ্ন ছয়মাসের মধ্যে নষ্ট হয়। প্রতিদিন এক প্রহর ব্যাপী এই সব প্রকরণের অভ্যাস দ্বারা যোগী মৃত্যুঞ্জয়ী হন—

"অধঃশিরশ্চোর্দ্ধাপাদঃ ক্ষণং স্যাত্‌ প্রথমে দিনে।
ক্ষণাঞ্চ কিঞ্চিদধিকমভ্যসেদ্দি দিনে দিনে।।
বলিতং পলিতং চৈব ষন্মাসাদ্ধি বিনাসয়েত্‌।
যামমাত্রস্তু যো নিত্যমভ্যসেত্‌ স তু কালজিত্‌।।"[২৩]
(হঠপ্রদীপিকার তৃতীয় উপদেশ)

শরীরের মধ্যে বায়ু ধরে রাখবার যে কথা আগে বলা হয়েছে তাকে আবার ধারণাও বলে। দেহের বিভিন্ন স্থানে বায়ু ধারণের বিভিন্ন নাম এবং তার বিচিত্র ফলাফলের কথা বলা হয়েছে গ্রন্থে। মোট কথা যোগীরা বিশ্বাস করে এসবের মাধ্যমে ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগ বা দেহরক্ষা করা যায়। দেহত্যাগের ইচ্ছা হলেই পরব্রহ্মে তারা লীন হতে পারবে। আবার প্রচুর ঐশ্বর্য লাভ করে জীবনে অনন্ত সুখ ভোগ করার ক্ষমতাও তারা অর্জন করতে পারে। ইচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণও করতে পারেন এরা যোগাভ্যাসের ভিত্তিতে।

হঠযোগ সম্পর্কে এই সামান্য ধারণা থেকেই আমরা বুঝতে পারি এরা ঈশ্বরের বদলে আত্মসুখের অন্বেষণে যোগ সাধনা করে। ফলে এরা কতটা ঈশ্বর-সাধক, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। এদের পথাবলম্বনে অনেক ধরনের বিপদের সম্ভবনাও আছে, তা বর্ণিত প্রক্রিয়া-পদ্ধতি থেকেই কিছুটা আন্দাজ করা যায়। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু প্রাপ্তিকে ঠাকুর তার জীবনে মর্যাদা না দেওয়ার কারণে এদের পথ তাঁর কাছে গ্রহণীয় নয়। ঠাকুর বলেছেন—

> "শরীর, টাকা, —এসব অনিত্য। এর জন্য —এত কেন? দেখ না, হঠযোগীদের দশা। শরীর কিসে দীর্ঘায়ু হবে এই দিকেই নজর! ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই! নেতি, ধৌতি— কেবল পেট সাফ করছেন। নল দিয়ে দুধ গ্রহণ করছেন!"[২৪]

Reference:

১. দত্ত, অক্ষয়কুমার, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', ১ম ভাগ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, পৃ. ২২১
২. সেন, নবীনচন্দ্র, 'নবীনচন্দ্র রচনাবলী', ২য় খণ্ড, দত্ত-চৌধুরী, ১৩৮২, পৃ. ২০২-২০৩
৩. নন্দী, রতনকুমার, 'কর্তাভজা ধর্ম ও সাহিত্য', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১২৫
৪. তদেব, পৃ. ১৫৭
৫. তদেব, পৃ. ১৫৮
৬. তদেব, পৃ. ১৫৮
৭. তদেব, পৃ. ১৫৬

৮. শ্রীম, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’,অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩২৫
৯. তদেব, পৃ. ৫৪৯
১০. তদেব, পৃ. ৮৩৫
১১. তদেব, পৃ. ২৬৪
১২. দাশগুপ্ত, মানদাশংকর, ‘যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ’, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪ জুন ২০০২, পৃ. ১১১
১৩. শ্রীম, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’,অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৪৬৭
১৪. তদেব, পৃ. ৭৯
১৫. তদেব, পৃ. ১৮৭
১৬. তদেব, পৃ.২৮৭
১৭. তদেব, পৃ. ৪৯৩-৪৯৪
১৮. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, ‘বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ’, তৃতীয় খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৪১
১৯. তদেব, পৃ. ৪৭
২০. শ্রীম, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’,অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৯৭৮
২১. তদেব, পৃ. ৯৭৮
২২. দত্ত, অক্ষয়কুমার, ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’, ২য় ভাগ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৭, পৃ. ৭২
২৩. তদেব, পৃ. ৭৫
২৪. শ্রীম, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’,অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৬৩